যায়যায়দিন

তারিখ ... 27 DEC 2006 ...
পৃষ্ঠা .. ৫ .. কলাম .. ৫ ......

মুহাম্মদ ওমর ফারুক

ঢাকা ইউনিভার্সিটি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

২৩ ডিসেম্বর ২০০৬ শেষ হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন। দুটি দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাদা প্যানেল সভাপতি, সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক, ট্রেজারার ও পাচটি সদস্য পদসহ মোট নয়টি পদে [illegible] হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী নীল দল সম্পাদক ও পাচটি সদস্যসহ মোট ছয়টি পদে জয়ী হয়।

বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনীতির ইতিহাসে ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রভূমি। 'অক্সফোর্ড অফ দি ইস্ট' নামে খ্যাত ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার। দেশ ও জাতির কল্যাণে ঢাকা ইউনিভার্সিটির অবদান অপরিসীম। এ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতির গুরুত্বও জাতির কাছে যে কারণে অনেকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিক্ষকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন, করে থাকেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন এ দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

সব ধরনের নির্বাচনের মতো প্রতিবছর শিক্ষক সমিতিরও নির্বাচন হয়ে থাকে। জাতীয় নির্বাচনের মতো প্রচার, গণসংযোগ এবং ভোটারদের কাছে ভোট চাওয়া হয় এখানেও। তবে পার্থক্য হলো এখানে ভোটারদের কোনো লোভ-লালসা দিয়ে প্রভাবিত করা যায় না। পোস্টারিং, মাইকিং, মিছিল-মিটিং হয় না সত্য কিন্তু বিভিন্ন কারণে এখানে ভোটের হিসাব-নিকাশ অনেক সময় পাল্টে যায়। দীর্ঘ দিনের নির্বাচনী ফলাফল গবেষণা করে দেখা গেছে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ও এলাকাপ্রীতির কারণে অনেকে প্রতিপক্ষের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নিজের দলের ভরাডুবি ঘটিয়েছেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসব ওপেন-সিক্রেট। ব্যাপারটা এ রকম, যেন সবাই জানে অথচ কেউ জানে না।

যাহোক, ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন, শিক্ষকদের কল্যাণে কাজ করাই শিক্ষক সমিতির প্রধান কাজ হওয়া উচিত। শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখা, ইউনিভার্সিটিসহ সারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করাও তাদের অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু আমরা দেখছি, শিক্ষক সমিতি গতানুগতিক রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠনে পরিণত হয়েছে ও হচ্ছে। নীতিহীন পলিটিশিয়ানরা যেভাবে অবিবেচকের মতো কথা বলেন, মিথ্যা প্রতারণামূলক আশ্বাস দেন, প্রতিপক্ষের প্রার্থীকে লক্ষ্য করে অসত্য ও হিংসাত্মক

ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে বিজয়ী সভাপতি সাদা দলের ড. সদরুল আমীন এবং নীল দলের সাধারণ সম্পাদক ড. আনোয়ার হোসেন

বিবৃতি দেন এবং ব্লাকমেইল করে থাকেন শিক্ষক, সমিতির নেতাদের অনেকেও তেমনটি করেছেন, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

শিক্ষকরা ব্যক্তিগতভাবে যে কোনো মতবাদে বিশ্বাস করতে পারেন। শিক্ষক সমিতিতে এসে কে কোন দলের বা কোন মতের অনুসারী এ বিভাজন থাকা ঠিক না। যার যার বিশ্বাস - মনে মনে। কর্মেই তার প্রতিফলন ঘটবে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতিতে যদি প্রচলিত নির্বাচনী ধ্যান-ধারণা বজায় থাকে তবে সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

শিক্ষকরা হবেন যে কোনো দলের লেজুড় সংগঠন। ছাত্ররাও তাই। তাহলে পার্থক্যটা থাকলো কোথায়? রাজনীতি আর শিক্ষা এক সঙ্গে চলতে পারে না। শিক্ষক রাজনীতি থাকবে, তবে তা গতানুগতিক নোংরা রাজনীতির ধারায় চললে হবে না। কোনো রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা তাদের কাজ নয়। দুর্নীতিবাজ পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে একই কণ্ঠে সুর মেলালে শিক্ষকদের স্বকীয় সত্তা থাকলো কই? আমাদের প্রচলিত রাজনীতির ধারাবাহিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ১৪ কোটি মানুষকে সহনশীলতা, ভালোবাসা আর সহমর্মিতার রাজনীতি শেখাতে পারেন একমাত্র শিক্ষকরা।

শিক্ষক রাজনীতিকে হতে হবে শিক্ষামুখী রাজনীতি। গবেষণার রাজনীতি। সত্যের রাজনীতি। ক্ষমতাসীনদের পাপাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিক্ত সত্য উচ্চারণের রাজনীতি। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের শিক্ষকরা আর্থিকভাবে অসচ্ছল। তাদের জন্য উচ্চতর বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এজন্য সরকারের কাছে দাবি জানানোর ও আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে শিক্ষক সমিতিকে। ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সঙ্কট, শিক্ষকদের প্রকট আবাসন সমস্যা, ক্লাসরুমের স্বল্পতা, আধুনিক শিক্ষা উপকরণের অনুপস্থিতি, দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে বহিরাগতদের নির্লজ্জ পদচারণার ব্যাপারে প্রশাসনকে পদক্ষেপ নিতে হবে। তারা কাজ করবেন দেশের সামগ্রিক কল্যাণে।

৩৬ বছরে উত্তীর্ণ বাংলাদেশকে অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে কে? পলিটিশিয়ানরা কখনোই তা করবেন না। শিক্ষকদেরকেই তা করতে হবে, জাতিকে পথ দেখাতে হবে। নিরাশা আর হতাশা থেকে উদ্ধার পেতে হলে ক্ষমতার লোভ ছাড়তে হবে।

আমাদের এমন একটা সুষ্ঠু ধারার প্রবর্তন করতে হবে, যা দেশের জন্য একটা মডেল হবে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ সব ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের জন্য এমন একটা নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে যাতে দলাদলি থাকবে না। নামের অদ্যাক্ষরের ধারাবাহিকতায়, ফ্যাকাল্টি বা ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে প্রাথমিক নির্বাচন এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

যেসব শিক্ষক কোনো না কোনো প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন, তারা সমিতির নির্বাচনে অংশ নেবেন না। একই ব্যক্তির একাধিক পদে বা একই পদে একাধিকবার মনোনীত বা নির্বাচিত হওয়ার মাঝে সামগ্রিকভাবে ইউনিভার্সিটির জন্য কোনো কল্যাণ নেই। সুস্থ ও যোগ্যতাসম্পন্ন সবার জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারলে শিক্ষক সমিতির নির্বাচন নিয়ে এতো আগ্রহ আর থাকবে না। এ ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি ক্লাবের প্রচলিত নির্বাচনের নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে। একই পদে কোনো ব্যক্তি একবারের বেশি নির্বাচন করতে না পারার বিধান তৈরি করা সময়ের দাবি। এতে করে অনেকটাই দলাদলির অবসান ঘটবে বলে অনেক শিক্ষকের বিশ্বাস।

লেখক : লেকচারার, ঢাকা ইউনিভার্সিটি।
omortdu@yahoo.com